মৃত্যু না হত্যা

রিপোর্ট : **আসাদুর রহমান**

বন্যপ্রাণীর মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। ধারণা করা হয়, কোনো দুর্ঘটনা না ঘটলে এ সময়ের মধ্যে ঐ প্রাণীটি মারা যাবে। সাধারণত চিড়িয়াখানা থেকে বনের ভেতরের প্রাণীর আয়ুষ্কাল বেশি হয়। খাঁচার ভেতর একটি প্রাণী কতদিন বেঁচে থাকবে এতোদিনে প্রাণী বিজ্ঞানীরা সে বিষয়েও একটি ধারণা পেয়ে গেছেন। আর তাই চিড়িয়াখানার প্রাণী পরিচিতি সাইনবোর্ডে সে সময়কাল উল্লেখ করা হয়। কিন্তু ঢাকা চিড়িয়াখানার ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই ব্যতিক্রম। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এই চিড়িয়াখানার প্রাণীদের মৃত্যু ঘটে। শুধু তাই নয়, কখনও ওদের মেরেও ফেলা হয়।

ঢাকা চিড়িয়াখানার প্রাণী মৃত্যু নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানকার অধিকাংশ প্রাণী নির্ধারিত বয়স হবার আগেই মারা গেছে। অসময়ে মৃত্যু চিড়িয়াখানার প্রাণীগুলোর জীবনে আজ অনিবার্য পরিণতি। ধারাবাহিকভাবেই এটি ঘটে চলেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮ মে চিড়িয়াখানা থেকে বিদায় নিয়েছে 'কাঞ্চা' নামের গন্ডারটি। নেপালের রাজা-রানীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে নেপাল সরকার কাঞ্চা-কাঞ্চি নামের দুটি গন্ডার বাংলাদেশকে উপহার দিয়েছিল। ঢাকা চিড়িয়াখানায় আগে কখনও গন্ডার ছিল না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানে মাত্র দুটি গন্ডারই ছিল। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন ছিল বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে চিড়িয়াখানায় প্রাণীটিকে টিকিয়ে রাখা। কিন্তু আমাদের অবহেলা প্রণীটিকে সময়ের আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে।

জীবজন্তুর প্রতি অবহেলা, অযত্ন, অপর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ চিড়িয়াখানায় আজ নিয়মে পরিণত হয়েছে। প্রাণীগুলোর প্রতি অবহেলার কথা উঠলেই বিরাগভাজন হতে হয় চিড়িয়াখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। সাংবাদিকদের আটক করে রাখার ঘটনাও ঘটিয়েছেন এখানকার কর্মকর্তারা। তবে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, খুব সহজেই তার প্রমাণ দেয়া যায়। গন্ডারটির মৃত্যুই চিড়িয়ানায় প্রাণীগুলোর প্রতি অবহেলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গন্ডারের মৃত্যু সম্পর্কে চিড়িয়াখানার সাইন্টেফিক অফিসার ডা. সাইদ আলী আহসান সাপ্তাহিক ২০০০কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায়, চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ ২১ এপ্রিল দেখতে পায় গন্ডারটি খোঁড়াচ্ছে। তখন তাকে কিছু ব্যথার ওষুধ দেয়া হলো, এরপর ৩০ তারিখ পর্যন্ত এর ওপর পরীক্ষা চালানো হয় প্রাণীটির ক্রিমি হয়েছে কি না,

এই ছোট খাঁচাটিতে রাখা হয়েছে ২টি চিতা

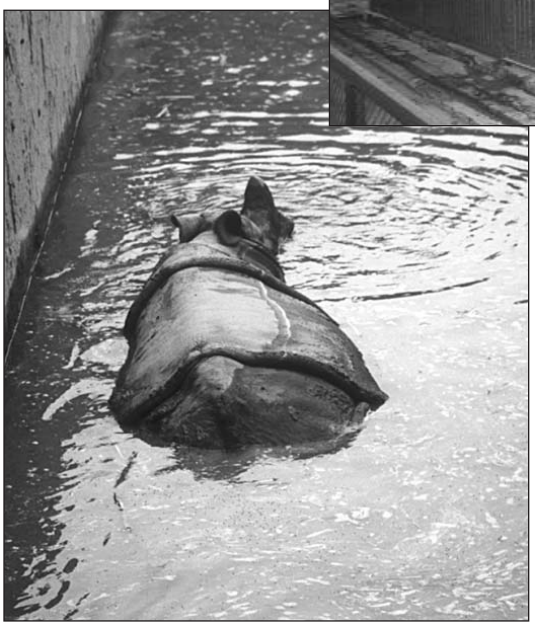

সঙ্গীর অভাবে একা ঘুরে বেড়ায় গন্ডার 'কাঞ্চি'

অতিরিক্ত হরিণগুলো ভুগছে খাদ্য সংকটে

ভিটামিনজনিত সমস্যা রয়েছে কি না। কিন্তু ট্রাংকুলাইজ করে প্রাণীটির যে পা খোঁড়াচ্ছে তা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন মনে করলেন না কর্তৃপক্ষ। ৯ মে গন্ডারটির খোঁড়ানো বাড়তে লাগলো। তখন সেটির পায়ের তলা পরীক্ষা করে দেখা গেলে সেখানে একটি ক্ষত রয়েছে।

পা পরীক্ষা করতে এতো দীর্ঘ সময় কেন নেয়া হলো বা টাংকুলাইজ করে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হলো না কেন প্রশ্ন করা হলে ডা. সাইদ আলী আহসান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা ট্রাংকুলাইজ না করেই ওর কাছে যেতে পারি। কিন্তু ক'দিন ওর মুড ভালো ছিল না। তাই ওর কাছে যেতে পারিনি' কিন্তু চিড়িয়াখানায় কর্মকর্তারা একবারও ভেবে দেখলেন না, পায়ে ব্যথা থাকলে তাদের নিজেদের কি মুড ভালো থাকবে!

ঢাকা চিড়িয়াখানায় কয়েকটি খাঁচার সামনে দাঁড়ালে প্রাণীদের প্রতি অযত্নের চিত্র ফুটে ওঠে। আফ্রিকা থেকে সংগ্রহ করা দুর্লভ প্রজাতির চিতাটিকে রাখা হয়েছে খাঁচা নং C1-এ। কর্তৃপক্ষের দাবি, এশিয়ার কোনো চিড়িয়াখানায় এই প্রজাতির চিতা নেই। সে কথা যদি সঠিক হয় তবে কেন চিতা দুটোর প্রতি এতো অযত্ন। চিতা দুটোকে রাখা হয়েছে ছোট্ট একটি খাঁচায়। খাঁচাটির আয়তন লম্বায় বড় জোর ৩০ ফুট আর প্রস্থে ৬ ফুট। এই

প্রজাতির চিতা খাঁচায় কখনও বাচ্চা দেয় না। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছেন খাঁচার ভেতর এর বংশ বৃদ্ধি ঘটাতো। জীবজন্তুর জীবন প্রণালীতে একটি নিয়ম রয়েছে যে, ওরা যদি মনে করে বাসস্থান ও খাদ্যের পর্যাপ্ত সুবিধা নেই, তবে ওরা পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে আসতে দেয় না। সেদিক থেকে বিবেচনা করে বলা যায়, এতোটুকু খাঁচায় চিতা দুটিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের মনের আশা হয়তো পূরণ হবে না। শিয়াল, খেকশিয়াল, মেছো বাঘ, প্রতিটি ভুগছে একই সমস্যায়- মাটিবিহীন পাকা ফ্লোরের মধ্যে রাখা বাঘ, সিংহগুলো নিয়ে পরিবেশবাদীদের মধ্যে সমালোচনা রয়েছে। তাদের দাবি- এটা কখনোই বাঘ, সিংহ রাখার পরিবেশ হতে পারে না। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বাঘ, সিংহের জন্য পানির ক্যানেলসহ ২টি বিশাল খাঁচা তৈরি করেছে। এ ধরনের খাঁচা বাঘ, সিংহের জন্য অনেক বেশি আরামদায়ক। অন্য বাঘ, সিংহগুলোকে এ ধরনের খাঁচায় রাখা যেতে পারে।

চিড়িয়াখানার কিউরেটর মোঃ মফিজুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, চিড়িয়াখানায় ৮টি বাঘ ও ৮টি সিংহের বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সেই বাসস্থানে থাকছে ১৫টি বাঘ ও ১৯টি সিংহ। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তবে কি ১৫টি বাঘ, সিংহের খাবার খাচ্ছে ৩৪টি। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রতিটির যে চাহিদা তা থেকে অর্ধেক খাবার পাচ্ছে প্রাণীগুলো। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি মেনে নিতে চান না কিউরেটর মোঃ মফিজুর রহমান। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'প্রতি বছর আমরা পরবর্তী বছরের বাজেট থেকে টাকা খরচ করে ফেলছি। গত অর্থবছরে আয় হয়েছে ১ কোটি ৭৬ লাখ টাকা। বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। অতিরিক্ত প্রাণী আমাদের ঘাটতি বাজেটকে আরো দীর্ঘায়িত করছে'

চিড়িয়াখানায় অতিরিক্ত জন্তুর মধ্যে রয়েছে বাঘ, সিংহ, হরিণ, জলহস্তি। কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা এশিয়ার বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় প্রাণী বিনিময়ের জন্য যোগাযোগ করে চলেছেন।

কিছু কিছু পাখির খাঁচাতেও অতিরিক্ত পাখি রয়েছে। পাখিগুলো যেন আর বংশ বৃদ্ধি না করতে পারে, সে জন্য তাদের প্রতি নেয়া হয়েছে অমানবিক ব্যবস্থা। পাখিগুলো যেন ডিম না পাড়ে সে জন্য কর্তৃপক্ষ খাঁচার ভেতর ওদের ডিম পাড়ার খাঁচা সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। পাখিগুলো এখন মাটিতেই ডিম পাড়ছে। বক আর ঘুঘু পাখির খাঁচার সামনে গেলে দেখা যায়, বেশ কিছু ঘুঘু আর বক মাটিতে ডিম পেড়ে তা দিচ্ছে।

যাই হোক, চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ গণ্ডারের মৃত্যু ঘটনাটিকে এখন গন্ডারের প্রজনন সমস্যা হিসেবে ব্যাখ্যা করছেন। ইন্টারনেট ঘেঁটে তারা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সেই

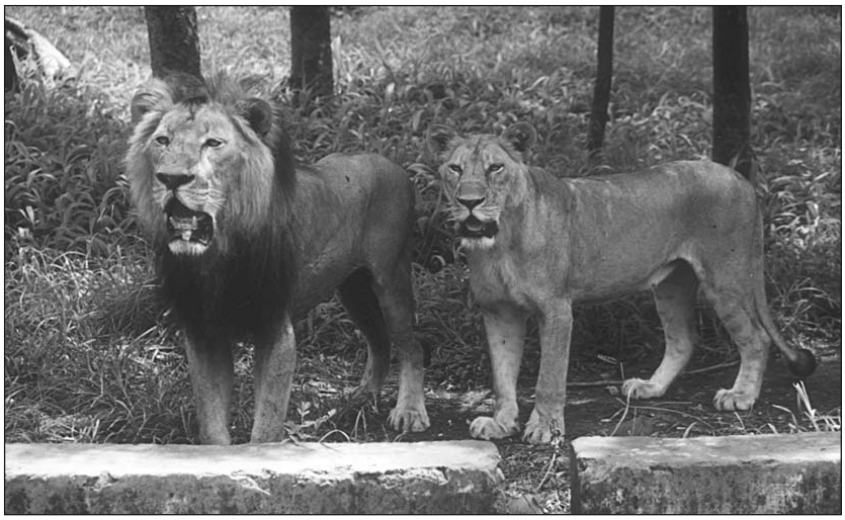

চিড়িয়াখানায় ৮টি বাঘ ও ৮টি সিংহের বাসস্থান ও খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু সেই বাসস্থানে থাকছে ১৫টি বাঘ ও ১৯টি সিংহ। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে তবে কি ১৫টি বাঘ, সিংহের খাবার খাচ্ছে ৩৪টি। ফলে স্বাভাবিকভাবে প্রতিটির যে চাহিদা তা থেকে অর্ধেক খাবার পাচ্ছে প্রাণীগুলো

তথ্যের ভিত্তিতে তারা বলছেন, দেখা গেছে, গন্ডারের মিলিত হবার সময় পুরুষটি অতিরিক্ত উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং এই সময় প্রায় ৫০% পুরুষ গন্ডার মারা যায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা গেছে, গন্ডারটির ব্রেন হেমারেজ হয়েছিল এবং তার দুই চোয়াল ভেঙে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বলছে, উত্তেজিত অবস্থায় গন্ডারটি দেয়ালে মাথা ঠুকে এই কান্ড করেছে। কিন্তু কর্মকর্তারা কি একবারও ভেবে দেখেছেন, পায়ের ব্যথাটি তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এমনও তো হতে পারে ব্যথা পা নিয়ে পানিতে নামতে গিয়ে গন্ডারটি মাথায় আঘাত পায় এবং সে থেকেই তার মৃত্যু ঘটে। কর্তৃপক্ষ হয়তো এ কারণেই গন্ডারের পায়ের ব্যথাটিকে একেবারেই আমলে নিচ্ছে না।

শুধু গন্ডারের মৃত্যুই নয়, বেশ কিছু বিষয়ে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বক্তব্য খুবই হাস্যকর। কিছুদিন আগে খাঁচা থেকে বেরিয়ে যায় একটি সিংহ। কিভাবে সে খাঁচা থেকে পালালো জানতে চাইলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চিড়িয়াখানায় এক কর্মকর্তা সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সিংহ সব সময় ঘরের অন্ধকার কোনায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। ঐ সিংহটি যেখানে মলত্যাগ করতো সে জায়গা বারবার ভিজে স্যাঁতসেঁতে নরম হয়ে গিয়েছিল এবং সিংহটি সেই স্থানটি ভেঙে বেরিয়ে পড়ে।' এই যদি হয় সিংহের চরিত্র তবে প্রশ্ন আসে কেন খাঁচার ঐ অংশটির প্রতি কর্তৃপক্ষ বিশেষ নজর দিলো না? সিংহের মলমূত্র ত্যাগের এই আচরণটি তো তারা জানতেন।

ঢাকা চিড়িয়াখানাটি কোনো পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হয়নি। শুরুতেই ভাবা প্রয়োজন, প্রজননের ফলে এখানে প্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সেই অতিরিক্ত প্রাণীর ব্যবস্থাপনা কি হবে তা নিয়ে আগেই ভেবে দেখা দরকার ছিল। তবে হয়তো আজ ২টি জলহস্তির জায়গায় ১০টি জলহস্তি রাখতে হতো না।

তাছাড়া চিড়িয়াখানার আর একটি সমস্যা হলো, এখানে প্রাণিবিদ্যার কোনো লোক নেই। পুরো চিড়িয়াখানা ভেটেরিনারি ডাক্তারদের দখলে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ড. আনোয়ারুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'চিড়িয়াখানায় যারা চাকরি করছেন তারা সবাই ভেটেরিয়ান। অর্থাৎ পশু চিকিৎসক। সেখানে প্রাণিবিদ্যার কর্মকর্তা, গবেষক নেই। যারা আছেন তারা প্রাণিবিদ্যার লোকদের মেনে নিতে পারেন না। বন্যপ্রাণী নিয়ে যারা পড়ালেখা করেন তাদের এখানে ঘেঁষতেও দেয় না। এখানে যেমন প্রাণীর ডাক্তারের প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন রয়েছে প্রাণিবিদ্যায় পড়ালেখা করা লোকজনের'

যেকোনো দেশের পর্যটন শিল্পে চিড়িয়াখানা একটি বড় অবদান রাখে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু দেশের বাইরে থেকে আসা কোনো পর্যটককে আজও আমরা বলতে পারি না ঢাকা চিড়িয়াখানার কথা। কিন্তু এই চিড়িয়াখানাটিই হতে পারতো রাজধানীর একটি বড় বিনোদন কেন্দ্র।

কে নিবে হাতি মৃত্যুর দায়

বাংলাদেশের সুন্দরবনে এক সময় গন্ডার ছিল। ভাবতেই অবাক লাগে। কিন্তু বিষয়টি একেবারেই সঠিক। পৃথিবীর কোথায় কোথায় গন্ডার আছে তার

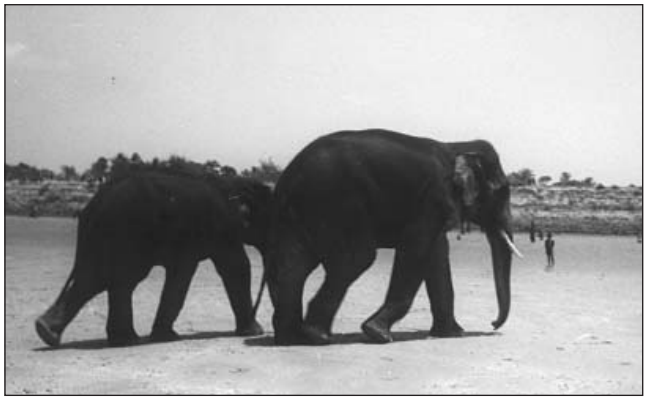

পুরনো ম্যাপ দেখলেই বিষয়টির সত্যতা বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা হিসেবে পরিচিতি পাওয়া গাজীপুরের ভাওয়ালগড় এলাকায় গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও চিতা বাঘ, হরিণের বসবাস ছিল। বন্যপ্রাণীতে সমৃদ্ধ আমাদের এই ভূখন্ড আজ বন্যপ্রাণীহীন হয়ে পড়েছে। ব্যাপকহারে বন নিধন, অপরিকল্পিতভাবে বন এলাকায় মানুষের বসতি গড়ে ওঠায় এ দেশের বন্যপ্রাণীর আজ এই দশা।

গত মাসে আমেরিকান সেন্টারে এক আলোচনা সভায় বলা হয়েছে, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশ ভূখন্ড থেকে আমাদের ৯০% প্রাকৃতিক সম্পদ শেষ হয়ে গেছে। যে ১০% আছে এর ব্যবস্থাপনা পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

এ দেশের বন্যপ্রাণী ও সম্পদের সঠিক চিত্র আজ এরকমের। আমরা নিজেদের সম্পদকে সংরক্ষণ করতে পারি না, বাঁচতে দেই না বন্যপ্রাণীদের- এমনকি অন্য দেশের সেধে দেয়া বন্যপ্রাণীকেও আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারি না। ভারত থেকে নেমে আসা দুটো হাতি নিয়ে এ দেশের বন বিভাগ কিছুদিন আগে এমনই এক দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে। শুধু নিজেদের অতিরিক্ত কাজের বোঝা এড়ানোর জন্য বন বিভাগ ভারতের হাতি দুটোকে ফিরিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে সরকারের দীর্ঘসূত্রতার জন্য প্রাণ হারিয়েছে একটি হাতি।

৬ মে ভারতের ঝাড়খন্ড থেকে দলছুট

হয়ে দুটো হাতি মেহেরপুর জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢুকে পড়ে। পরের দিন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নেয় হাতি দুটোকে ফিরিয়ে নেবার। ঐ দিন ভারতের প্রধান বন সংরক্ষক অতুনু রাহা ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশের নির্বাহী কর্মকর্তা ড. আনোয়ারুল ইসলামকে জানালেন, বর্ডারে তাদের লোকবল, মাহুত, ট্রাক তৈরি হয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকার অনুমতি দিলে তারা হাতি দুটোকে নিয়ে যাবে।

ভারতীয় দলকে বাংলাদেশে ঢোকার অনুমতি চেয়ে মেহেরপুরের ডিসি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ফ্যাক্স করেন। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট থেকেও এই অনুমতি দেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনেক বার অনুরোধ জানানো হল। কিন্তু মন্ত্রণালয় বুঝলো ঠিক উল্টোটি। শনিবার সন্ধ্যায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব ডিসিকে ফোন করে বললেন, 'হাতি দুটো ছেড়ে দাও'।

হাতি তো ছাড়াই রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশে ঢোকার অনুমতি দেয়নি। মন্ত্রণালয় মনে করেছে, হাতি ছেড়ে দিলে ভারতের দিকে চলে যাবে। কিন্তু হয়েছে উল্টো। হাতি দুটো ঢুকে পড়ে আরো ভেতরে। ৮ মে পর্যন্ত হাতি দুটো সীমান্তের ৫/৭ কি.মি-এর কাছাকাছি ছিল। এ প্রসঙ্গে ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. আনোয়ারুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শনিবার পর্যন্ত হাতি দুটো সীমান্তের যতটুকু কাছাকাছি ছিল সেখান থেকে ওদের তাড়িয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া যেতো। ফলে ওদের ট্রাংকুলাইজ করার প্রয়োজন হতো না।'

৯ মে থেকে ১৩ মে পর্যন্ত সরকার পক্ষ এ নিয়ে আলোচনা করলো। ভারতীয় দল ঢোকার অনুমতি প্রায় সম্পন্ন। এ অবস্থায় মন্ত্রী বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে আর একটু ভাবার প্রয়োজন'। ১৫ মে সন্ধ্যায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে ঢোকার অনুমতি পেলো।

অনুমতি পাবার এই সময়ের মধ্যে হাতি দুটো মেহেরপুর থেকে চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ পার হয়ে বাগেরহাট চলে গিয়েছিল। বাগেরহাটেই হাতি দুটোকে ট্রাংকুলাইজ করে ধরা হয়। এই ট্রাংকুলাইজ কার্যক্রমের সময় একটি হাতি পুকুরে পড়ে যায়। অনেক কষ্ট করে সেটিকে পানি থেকে ওঠানো হয়। এ প্রসঙ্গে ড. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, 'আগে যদি অনুমতি পাওয়া যেতো তবে হাতি দুটোকে শুষ্ক সমতল এলাকায় ট্রাংকুলাইজ করে ট্রাকে ওঠানো যেতো। বাগেরহাট থেকে হাতি দুটো ধরা হলো। সেখানে বেশির ভাগ জায়গায় চিংড়ির ঘের, জলাভূমি। তাই একটি হাতি পানিতে পড়ে যায়। জলাভূমি এলাকা হওয়ায় এদের ট্রাংকুলাইজ করা, ট্রাকে ওঠানোতে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে। পাশাপাশি হাতি দুটোরও কষ্ট হয়েছে।' এ টানাহেঁচড়ার কারণেই ১৮ মে একটি হাতি মারা যায়।

ভারতীয় লোকজনকে বাংলাদেশে ঢুকতে দিতে যখন বিলম্ব হচ্ছিল, সেই সময়ে হাতি দুটো হেঁটে হেঁটে সীমান্ত ছেড়ে দেশের ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছিল। সেখান থেকে ভারতে ফিরিয়ে নেয়া হাতি দুটোর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে- এসব বিষয় ভেবে ভারতীয় পক্ষ হাতি দুটোকে বাংলাদেশে রেখে দেয়ার জন্য অনানুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেয়। ভারতের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব ফরেস্ট এসএস বিষ্ট দিল্লি থেকে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনার সিনহা টেলিফোনে ড. আনোয়ারুল ইসলামকে হাতি দুটো বাংলাদেশের জঙ্গলে ছেড়ে দেয়ায় প্রস্তাব দেন। এ প্রসঙ্গে ড. আনোয়ারুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ওরা আমাকে বলে তোমরা যদি এটিকে রাখতে চাও তবে আমাদের লোক নিয়ে এসে এদের ট্রাংকুলাইজ করে তোমরা যেখানে রাখতে চাও সেখানে দিয়ে আসবে। ওরা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মাঝামাঝি চুনতি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে হাতি দুটো রাখতে

বলে। কারণ সেখানে আমাদের একটি বড় সংখ্যক হাতি রয়েছে। ড. আনোয়ারুল ইসলাম বন সংরক্ষক শামসুর রহমানের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন। জানা যায়, শামসুর রহমান বাংলাদেশে প্রধান বন সংরক্ষক মুন্সী আনোয়ারুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তারা হাতি দুটো রাখার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখালেন না।

চুনতির স্যাংচুয়ারিটিতে এখন যে বনাঞ্চল রয়েছে তার অবস্থা খুবই খারাপ। আর সে জন্য ড. আনোয়ারুল ইসলাম কাপ্তাইতে হাতি দুটো রাখার প্রতি মত দেন। কিন্তু বন বিভাগের এই দুই কর্মকর্তা সেদিকে কোনো কর্ণপাত করেননি।

এ প্রসঙ্গে বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিভাগের বন সংরক্ষক শামসুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা এ ধরনের কোনো প্রস্তাব ভারতীয় পক্ষ থেকে পাইনি। শেরপুর-নেত্রকোনা এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় আমাদের ২০০ হাতি রয়েছে। তাছাড়া ওপার হতে হাতি প্রায়ই লোকালয়ে এসে সমস্যার সৃষ্টি করে। ওগুলোকে নিয়েই আমরা সমস্যায় আছি। তাছাড়া এই হাতি দুটোর লোকালয়ে আসার অভ্যাস হয়ে গেছে। ওরা আবার হয়তো লোকালয়ে চলে আসতে পারে।'

বাংলাদেশ ভূ-খন্ডে যে ২০০ হাতি রয়েছে সেগুলো 'এশিয়ান এলিফেন্ট' প্রজাতির। ভারত থেকে চলে আসা হাতি দুটো ছিল একই গোত্রভুক্ত। তাই সহজেই এই হাতি দুটোকে বাংলাদেশের হাতিগুলোর দলের ভেতর অন্তর্ভুক্ত করা যেতো। তাছাড়া খাগড়াছড়ির পাবলাখালী ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিতে হাতি রয়েছে, সেখানেও এদের ছেড়ে দেয়া যেতো। এ প্রসঙ্গে ড. আনোয়ারুল ইসলাম ২০০০কে বলেন, 'একই প্রজাতির হওয়ায় হাতি দুটোকে এ দেশের হাতিগুলোর সঙ্গে মেলানো যেতো। তবে সে জন্য কিছু সময় লাগতো। এদের প্রতি বিশেষ নজর দিতে হতো। এতে খুব বেশি খরচও হতো না।'

জানা যায়, হাতি দুটোকে যদি বাংলাদেশের যেখানে হাতি রয়েছে এমন বনে ছাড়া হতো তবে স্থানীয় হাতিগুলো ওদের প্রথম দিকে মেনে নিতে চাইতো না। প্রাণী জগতে নিজের এলাকায় নতুন অতিথিকে মেনে নিতে চায় না। তবে কিছুদিনের মধ্যে বড় দল থেকে অন্য হাতি নিয়ে ঐ হাতি দুটো নতুন দল তৈরি করে ফেলতে পারতো। প্রথম দিকে হাতি দুটোকে বিশেষ নজরে রাখতে হতো। আর সেই অতিরিক্ত দায়ভার মেনে নিতে চায়নি বাংলাদেশ বন বিভাগ। তারা ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় পক্ষের প্রস্তাব। শামসুর রহমানের মতো বাংলাদেশের প্রধান বন সংরক্ষক মুন্সী আনোয়ারুল ইসলাম ভারতীয় পক্ষের এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করছেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি দীর্ঘ সময় মন্ত্রণালয়ে বসে ভারতের লোকজনকে এ দেশে ঢোকার অনুমতি নিয়েছি। ভারতীয় পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রস্তাব আমি পাইনি। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্টের ড. আনোয়ারুল ইসলামের মাধ্যমে এমন কোনো প্রস্তাব আমার কাছে আসেনি।'

এ দেশের বন কর্মকর্তাদের এ ধরনের দায়িত্ব এড়ানোর মানসিকতায় হাতি দুটো ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য হলো। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, গত সেপ্টেম্বরে বিডিআর অফিসার লেঃ কর্নেল কে এম মোমিনুর রহমান খাগড়াছড়ির পাবলাখালী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ঢুকে গুলি করে একটি হাতি হত্যা করে। নবেম্বরে সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত রাস মেলায় প্রায় ৫০০ হরিণ মেরে আগত অতিথিদের ভূরিভোজন করানো হয়। আইন থাকার পরও এসব বন্য প্রাণী হত্যার বিচার আজও হয়নি। যখন দেশে এমন পরিস্থিতি বিরাজ করছে, তখন বন কর্মকর্তারা হাতি দুটো ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেবে সেটাই স্বাভাবিক।

তবে একটি সুখের কথা হলো, এ দেশের বন কর্মকর্তারা বন্য প্রাণীর প্রতি যতই নিষ্ঠুর আচরণ করুক না কেন, এ দেশের সাধারণ মানুষ বন্য প্রাণীকে ভালোবাসে। বারবার তারা সেই পরিচয়ও দিয়ে আসছে। ভারত থেকে ভেসে আসা আহত শিশু হাতি পুতলিকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এ দেশের মানুষ। ভারত থেকে চলে আসা এই হাতি দুটোর আতিথেয়তা করতে কার্পণ্য করেনি গ্রামবাসীরা। এই ক' দিনে হাতি দুটো বিভিন্ন গ্রামের কলা গাছ খেয়েছে। গাছের কাঁঠাল খেয়েছে কিন্তু গ্রামবাসী তাতে বিরক্ত হয়নি। উপরন্তু গরম থেকে রক্ষা পাবার জন্য বালতি ভর্তি পানি খেতে দিয়েছে হাতি দুটোকে, গায়ে পানি ছিটিয়ে দিয়েছে।

ছবি : **খালেদ সরকার ও ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ**

'ওরা আমাকে বলে তোমরা যদি এটিকে রাখতে চাও তবে আমাদের লোক নিয়ে এসে এদের ট্রাংকুলাইজ করে তোমরা যেখানে রাখতে চাও সেখানে দিয়ে আসবে'

ড. আনোয়ারুল ইসলাম
নির্বাহী কর্মকর্তা
ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অব বাংলাদেশ

'ভারতীয় পক্ষ থেকে এমন কোনো প্রস্তাব আমি পাইনি। ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্টের ড. আনোয়ারুল ইসলামের মাধ্যমে এমন কোনো প্রস্তাব আমার কাছে আসেনি'

মুন্সি আনোয়ারুল ইসলাম
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ বন বিভাগ